গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা ২০২২

আশ্বিনের শারদ প্রাতে মায়ের আগমন গজরাজের পৃষ্ঠে উত্তরণ করে। দুর্গতি নাশিনী মায়ের আশিসে দূর হোক সব কালিমা, লোভ-লালসা, অর্থলোলুপ বিকৃত চেতনার মিথ্যা মায়াজাল। অসুরদলনি অভয়া মায়ের পাদস্পর্শে শুভ চেতনার উন্মেষ হোক। চারিদিক ভরে উঠুক নব সূর্যোদয়ের আভায়। আর যা কিছু মন্দ, অমানবিক, হানিকারক – সব ভেসে চলে যাক দশপ্রহরণধারিণী মায়ের নৌকার টানে। মানব মননে পুনরুজ্জীবিত হোক মনুষ্যত্ব...

কলম হাতে

প্রণব কুমার বসু, শুভ্র নাগ, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, নাহার আলম, মৌ বিশ্বাস, লিপিকা রানী সাহা, চৈতি চক্রবর্তী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

গুঞ্জনের নিবেদন

‘গুঞ্জন’ মাসিক ই-পত্রিকা রূপে ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমরা প্রতিবছর পাণ্ডুলিপির পক্ষ থেকে একটি করে ই-পুস্তক (ই-বুক) প্রকাশ করি। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। গত তিন বছরে যথারীতি তিনটি ই-বুক প্রকাশ করা হয়েছে। ই-বুক হল এমন একটি মাধ্যম, যা অতিশয় সহজলভ্য। ঘরে বসে খুব সহজেই আমরা মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমে যখন ইচ্ছা ই-বুক পড়তে পারি। আর সব থেকে বড় কথা এটা যে – পরিবেশ সংরক্ষণে ই-বুক-এর একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। ই-বুক প্রকাশ করার জন্য কোন বৃক্ষছেদনের প্রয়োজন হয় না।

দেবী দশভুজা মায়ের আশীর্বাদ, আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং ভালবাসা নিয়ে এই বছরের ‘গুঞ্জন’ শারদীয়া সংখ্যার ই-বুকটি প্রকাশ করা হল। আমাদের এই ই-বুক বহু নামী গুণী এপার ও ওপার বাংলার লেখক-লেখিকাদের শৈল্পিক লেখনীর সোনালী স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। শারদীয়ার উপহার স্বরূপ এই ই-বুকটি উপস্থাপন করতে পেরে আমরা সত্যি আন্তরিকভাবে আপ্লুত। আশা করি, সকল লেখক ও লেখিকাদের গল্প, কবিতা আপনাদের পুজোর ছুটির আমেজকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করবে।

সকলকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছো। দুর্গোৎসবের দিনগুলি সকলের জন্যই সুন্দর ও আনন্দময় হয়ে উঠুক। কেউ কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে ভুলবেন না। ■

কলম হাতে

মাতৃপূজা

শুভ্র নাগ

মহালয়ার ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুমটা ভাঙল রেডিওতে "মহিষাসুরমর্দিনী" স্তোত্রপাঠে। এখন বছরের সবসময় এই স্তোত্রপাঠ শোনা গেলেও কেন জানি না এইদিনের ব্রাহ্মমুহূর্তে রেডিও থেকে ভেসে আসা এই স্তোত্রপাঠকে আজও নতুন মনে হয় – মহালয়া আর দুর্গাপূজার মধ্যে কোন সম্পর্ক না থাকলেও মনে হয় মহাষষ্ঠী নয় – মহালয়ার ভোরেই শুরু হল মা দুর্গার বোধন।

রেডিওতে শেষ হল "মহিষাসুরমর্দিনী" – টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে চলছে এরই দৃশ্যায়ন – বেরিয়ে পড়লাম গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশ্যে – বছরে এই একবারই তো তর্পণ করি আমার বিদেহী বাবা, মা, আত্মীয়, অনাত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের উদ্দেশ্যে – পূর্বাকাশে প্রথম সূর্য – গঙ্গায় মানুষের ভিড় – এক সুরে না হলেও কৃতাঞ্জলি হয়ে পূর্বপুরুষদের আহ্বান – **"ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোহঞ্জলিম্।"** বড়ো ভালো লাগে — তৃষ্ণার্ত পূর্বপুরুষরা আসছেন একটু জলের আশায় – এক অঞ্জলি জলেই তাঁরা তৃপ্ত – অবিশ্বাসী মন এসবকে অস্বীকার করে বটে – কিন্তু সারা বছর দৈনন্দিন কাজে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়া জীবনে এঁদের মনে না পড়লেও

বন্দনা

বৎসরান্তে এই স্মরণক্ষণে কোথায় যেন মনে এক প্রশান্তি আসে – যা অনুভব করা যায় – ব্যাখ্যা করা যায় না।

তর্পণশেষে এরকমই এক প্রশান্তি নিয়ে উঠে আসছি গঙ্গার ঘাট থেকে দূরে মাইকের মাধ্যমে একটি মন্ডপ থেকে ভেসে আসছে আজ সন্ধ্যায় তাদের মন্ডপের দেবী দুর্গার আবরণ উন্মোচনের আমন্ত্রণ কথাটা, দুর্গাপ্রতিমা হলে হয়তো কানে লাগতো না। প্রতিমা শব্দটা না থাকায় কথাটা বড় কানে লাগল। নিজের মনেই হাসলাম – মনে পড়ল বহুদিন আগে দেবীসুক্ত আলোচনার সময় কথাপ্রসঙ্গে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন – দেবী স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই ভাবলাম আমাদের কি সাধ্য আবরণ উন্মোচন করে তাঁকে প্রকাশ করার!

গঙ্গার পাড়ে চায়ের দোকান। ওখানে একটু চা খেয়ে আবার ফিরলাম গঙ্গার ঘাটে – ভোরবেলার এই পরিবেশটা ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। গঙ্গার ঘাটে বাঁধানো চাতালটায় বসলাম। এখানে ভীড়ের মধ্যেও নির্জনতা খুঁজে পাওয়া যায়। আগে এই চাতালে ধর্মসভা হত। আমি এসেছি বারকয়েক – এক বয়স্ক সাধু মহারাজ শাস্ত্র আলোচনা করতেন – কালের নিয়মে সেসব আজ বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সাধু মহারাজ আজ ইহজগতে আছেন কি না তা জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু কি জানি কেন আজ বড় মনে পড়ল তাঁর কথা। এই ভীড়ের মধ্যে খুঁজে নেওয়া এই নির্জনে বসে মনে পড়ল বহুদিন আগে দুর্গাপূজার আগে এক সন্ধ্যায় তাঁর শাস্ত্র আলোচনার কথা।

বন্দনা

সেদিন তিনি বলছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীমূর্তি কিভাবে দেবীমূর্তিতে প্রতীয়মানা হয়েছেন এবং সেই দেবীমূর্তিকে গৃহস্থ থেকে সাধকগণ – তাঁরা অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী বা সাকারবাদী বা নিরাকারবাদী যাই হোন না কেন - কিভাবে দেখেছেন অনুভব করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, সাধনা করেছেন... তাঁর সেদিনের কথায় বারবার পরিস্ফূট হয়ে উঠেছিল গৃহস্থ আর সাধকের দৃষ্টিতে দেবীর মাতৃরূপ আর কন্যারূপের কথা – মাতৃরূপে তিনি অম্বিকা, দুর্গা, কাত্যায়নী, শিবানী, অন্নপূর্ণা, কালী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিতা আবার তিনিই কন্যারূপে আমাদের ঘরের উমা।

সেদিন অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিলাম তাঁর কথা। তিনি বলছিলেন পুরুষ আর প্রকৃতির কথা, বলছিলেন পরমাপ্রকৃতির কথা। বলছিলেন মাতাই হন বা কন্যাই হন আসলে এসবই আদিশক্তি পরমাপ্রকৃতিরই রূপ – যে আদিশক্তি ঋগ্বেদে নিজেকে প্রকাশ করেন এভাবে – **"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্/.তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।"**

তিনি আরও বলছিলেন - এই দেবীই আমাদের আরাধ্যা। তাই একজন গৃহস্থ তাঁর কাছে নিঃসঙ্কোচে প্রার্থনা করেন – **"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।"** একজন অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর প্রার্থনা করেন – **"অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে – জ্ঞানবৈরাগ্যাসিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতী।"** আবার এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ

এই দেবীর কাছেই করজোড়ে মিনতি করেন – "Open the gates of light, O Mother, to me Thy tired son. / I long, Oh, Long to return home, Mother, my play is done"

কাল থেকে দেবীপক্ষের শুরু। ভাবছিলাম – কাল থেকে সারা ভারতে নবরাত্রির পুজো শুরু। কিন্তু বাংলার নীলাকাশসাগরে সাদা মেঘের পানসী, কাশের দোলায় চিত্রিত শরতের আশ্বিন, পদ্মদিঘিতে লাল সাদা পদ্মের ঢেউ, বাড়ির উঠোনে শিউলির আলপনা – আর সে আলপনায় পা রাখতে দেবী দুর্গা কন্যা উমা হয়ে আসছেন আমাদের পর্ণকুটিরে - মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এসে দাঁড়াবেন বিল্ববৃক্ষতলে – বহিরঙ্গে তিনি সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দশভভুজা সঙ্গে দেবসেনাপতি কার্তিক, সিদ্ধিদাতা গণেশ, ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী আর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী আর আমাদের অন্তরে তিনি ঘরের মেয়ে দ্বিভুজা উমা... বৎসরান্তে পিতৃগৃহে পুত্রকন্যা নিয়ে আসা এক কন্যা বই কিছু নন – আদতে কন্যাও তো মা।

ফিরে গেলাম সেদিন ওই সাধু মহারাজেরর কথায়। তিনি বলছেন আমাদের সবার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন মা – যে মায়ের কাছে পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় পাওয়া যায়, নিঃসঙ্কোচে আর্তি জানানো যায় – যে মায়ের ক্ষমাসুন্দর চোখে আমাদের সব দোষ মার্জনা পায়। তাই চিন্ময়ীরূপে তিনি বরাভয় দেন আমাদের – **"আমার ছেলে যদি ধূলোকাদা মাখে আমাকেই তো ধূলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।"**

বন্দনা

ছোটোবেলায় দেবী দুর্গার ওপর রচিত একটি কবিতা পড়েছিলাম – কবির নাম ও পুরো কবিতার একটি দুটি লাইন ছাড়া সবই আজ আমার বিস্মৃতির অতলে। তারই মাঝে যে লাইনটি আমার ভাল লাগত সেটি হল – **"দশহাতে ধরো দশপ্রহরণ দশদিক করো ত্রাণ।"** ছোটোবেলায় মন্ডপে মন্ডপে দেবী দুর্গার দশহাত সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবী দেখে কল্পনার এক সুন্দর জগতে ভাসতাম। কিন্তু সেদিন এই চাতালে সেই সাধু মহারাজ কি গভীর প্রত্যয়ে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন দেবী দুর্গার এই রূপ। মনে পড়ছে তিনি বলেছিলেন দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী কেউ পৃথক নন। একই আদিশক্তি তিনরূপে প্রকাশিতা। তিনি বলছিলেন – দেবীর এইরূপ যাঁরা ধ্যানে পেয়েছিলেন বা তৈরী করেছিলেন তাঁরা দেবীর সর্বজনীন বিশ্বজনীন রূপটিই তুলে ধরেছিলেন আমাদের সামনে।

সেদিন এই সাধুই আমাদের শিখিয়েছিলেন দেবী দুর্গার দশহাতের অর্থ – তাঁর কাছে এই দশহাত মূলতঃ সন্তানকে দশদিক থেকে আগলে নিশ্চিন্তে রাখবার এক প্রতীক – মাতৃত্বের এক চিরন্তন প্রকাশ। এই মায়ের মধ্যেই রয়েছে সিদ্ধি, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, শৌর্য – সংসারে যা কিছু অসুন্দর আসুরিক এই মা তার বিনাশ করেন। মহিষাসুর বধের মাধ্যমে এই ভাবনাটাই দুর্গাপ্রতিমার মধ্যে পরিস্ফূট।

সমাজচেতনার দৃষ্টিতে দেবী দুর্গার আর এক রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন এই প্রাচীন সাধু। আমাদের সমাজে

আগেকার যে বর্ণাশ্রম ছিল – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র – দেবী দুর্গার ডান ও বামপাশের দেবদেবীরা যে তারই প্রতীক সেটাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন খুব সুন্দরভাবে – তাঁর কথায় জ্ঞানের দেবী সরস্বতী, দেবসেনাপতি কার্তিক, ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী এবং জনগণেশের সিদ্ধিদাতা গণেশ এই চারজন পর্যায়ক্রমে এই বর্ণাশ্রমের দ্যোতক। পৃথিবীতে যা কিছু সমৃদ্ধি তা মানুষের কঠোর পরিশ্রমের ফসল ছাড়া কিছুই নয় – আর তারই স্বীকৃতি হিসেবে মানুষের তথা জনগণেশের পুজো প্রথমেই করা হয় গণেশের পুজোর মাধ্যমে।

দুর্গাপূজায় অন্ত্যজ থেকে ব্রাহ্মণ সবার সমান অধিকারটিকেও তিনি ব্যাখা করেছিলেন সেদিন – সমাজের কামনাকলুষকে যে নারীরা নিজদেহে সর্বংসহা হয়ে ধারণ করে সমাজকে শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন তাঁরাও তো মায়ের সন্তান। তাই সমাজের কাছে তাঁরা অবহেলিতা হলেও মা তো মুখ ফেরান না। তাই তাঁদের দরজার পবিত্র মাটি না হলে তো মাতৃপ্রতিমা তৈরীই হবে না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষও তো মায়েরই সন্তান। তাই কামার, কুমোর, মালাকার, ঢাকী থেকে ব্রাহ্মণ সবারই অংশগ্রহণ না হলে মাতৃপূজা তো সম্পন্ন হবে না। তাদের স্পর্শ ছাড়া মা থাকতে পারেন না, আর তাই দুর্গাপূজা যথার্থ অর্থে হয়ে ওঠে মাতৃপূজা। হয়ে ওঠে মহাপূজা – যে মহাপূজা সাম্প্রদায়িকতা ভেদাভেদের উর্দ্ধে এক বিশ্বশান্তির পূজা – এক সংহতির পূজা। এই পূজাতেই গ্রহণ

করা হয় কৃষিসম্পদ, জলসম্পদ, খনিজসম্পদ রক্ষার অঙ্গীকার। দেবী দুর্গার পুজোয় তাই প্রথমেই আসে নবপত্রিকা স্নান, পরমাপ্রকৃতি অন্নদাত্রী মা প্রকৃতিস্বরূপা হয়ে রক্ষা করেন আমাদের কৃষিসম্পদ। তাই নয়টি গাছকে তাঁর রূপকল্প মেনে নিয়ে সেই গাছগুলির পাতা – শাখা একসঙ্গে বেঁধে স্নান করিয়ে রাখা হয় গণেশের পাশে – চলতি কথায় কলাবউ বলি বটে — কিন্ত এই নয়টি গাছ হল কলা, ধান, অশোক, হলুদ, বেল, কচু, ডালিম, মানকচু আর জয়ন্তী — যা দেবী দুর্গার যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, লক্ষ্মী, শোকরহিতা, উমা, শিবানী, কালিকা, রক্তদন্তিকা, চামুন্ডা এই নয়টি রূপকে চিহ্নিত করে।

মাতৃপূজার মহাস্নানটিও এক প্রতীকি তাৎপর্য বহন করে। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার জল, তেল, মৃত্তিকা ইত্যাদি দিয়ে স্নান করানো হয় দেবীকে – যা দেবী সর্বভূতেষুরই এক ব্যবহারিক পরিস্ফূটন।

এরপরে তিনি বুঝিয়েছিলেন, কুমারী পূজা, সন্ধিপূজার মত অনুষ্ঠানে মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ীরূপে পুজো করার মধ্যে ধর্মীয় তাৎপর্য যাই থাকুক না কেন – এটি মূলতঃ নারীশক্তি উদ্বোধনের পুজো। যে নারী মাতৃরূপে আমাদের রক্ষা করেন। আর সন্ধিপুজো শুধুমাত্র দুই তিথির মধ্যে থেকে যাওয়া শূণ্য তিথিতে মহিষাসুর বধের স্মরণের পুজো নয়। সকল অশুভ নাশ করে চিৎশক্তিস্বরূপিনী মা যে আমাদের সঠিক পথে চালনা করেন তার পুজো। তাঁর রণরঙ্গিনী রূপের পাশাপাশি সন্তানের কল্যাণে তিনি সদাসর্বদা কল্যাণময়ী রূপে

বরাভয়দাত্রী। তিনি বিশ্বপ্রসবিনী – তিনি ত্রিগুণাতীতা – তিনি জগৎপালিকা -- সারা জগতেই তিনিই একমাত্র সত্য – শ্রীশ্রী চন্ডীর **"যা দেবী সর্বভূতেষু"** শ্লোকগুলি সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তিনি। সেদিনের তাঁর আলোচনা আমার অনুসন্ধিৎসা যে বাড়িয়ে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কতক্ষণ ওই ভাবজগতে ছিলাম জানি না – মনে হচ্ছিল সেদিনের সেই সাধু কোন এক মন্ত্রবলে আমার সামনে – এসেছিলাম তর্পণ করতে – তারপর কি যে হোলো – সম্বিৎ ফিরল চায়ের দোকানের লোকটির কথায় — "কি মশাই, এখানে রোদে বসে আছেন? শরীর ঠিক আছে তো? চা খাবেন?"

সম্বিৎ ফিরতে দেখি সত্যিই বেলা হয়েছে। গঙ্গাতে তর্পণ চলছে এখনও। আমি উঠে পড়ে চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়ালাম। কাছের মন্ডপ থেকে মাইকে ভেসে আসছে —

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।" ■

বিবর্তিত পূজা

লিপিকা রানী সাহা (বাংলাদেশ)

আজ শরৎ ভোরে, ঘরের দোরে
শিউলি ফুটে হাসে না,
তাই মনটা আমার পূজার সুরেও ভাসে না।
এখন বসত বাড়ির উঠান কোনে
কাশের ছবি থাকে না,
হৃদয় মাঝে তাইতো আর
ঢাকের সুরও সাজে না।

মায়েরা আজ বাতের ব্যথায়
আগের মতো হাসে না,
পাল্লা দেওয়া কাজের নেশায়
আজকে তারা ছোটে না,
তাইতো এখন মাটির ডিবায়
মুড়কি নাড়ু থাকে না।

আজ হাত বাড়ালেই দোকান সারি
কাপড় কিনে মনটা ভরি,
তাই রাত্রি জেগে কাপড় কেটে
সূচ সুতোর হিসাব কষে

পরিবর্তন

তৈরি হওয়া নতুন জামার
স্বাদটা প্রাণে আসে না...
নুতন জামার পুজোর স্বাদে
মনটাও আর হাসে না।

আজ হাত বাড়ালেই রেস্তোরাঁতে
নানান স্বাদের খাবার পাতে,
তাইতো পূজা দেখে ফেরার পথে
ময়রার দোকানে চিঁড়ার সাথে
আগের মতো দই মিষ্টি
এখনতো আর টানে না...
তাইতো মন যে আজকে আমার
পূজা পূজা করে না।

ক্যালেন্ডারের পাতা ঘুরে
বর্ষা বাদল গরম সরে,
শরৎ আকাশে তুলোর ভেলায়
মনটা এখন ভাসে না...
তাই আগের মতো হিসেব করে
মাস সপ্তাহ দিনের পরে,
হৈহল্লা ভরা যাত্রা পালায়
পূজার দিন আর কাটে না।

পরিবর্তন

মেলার মাঠের হাতি ঘোড়া
নাগরদোলায় আকাশ চড়া
আজ আর কাছে টানে না,
তাইতো কেবল দিন গুনে
মনের মাঝে আবীর রঙে
ঘন্টা কাঁসর ধুপ ও ধূনোয়
হৃদয় আমার মাতে না,
রঙিন খুশির জোয়ার এনে
আজ যে পূজা আসে না...

আজ নগর জীবন হৈ-হুল্লোড়ে
সময় কাটে ভিন্ন সুরে
আকাঙ্খার চাদর মুড়ে তাই
মনকে পূজা টানে না,
বিবর্তনের এমন ধারায়
পূজায় খুশি হাসে না।। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ আমার উমা দিদি...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১৩ বছর

দেবী দুর্গা অর্থাৎ উমা তো আমাদের ঘরের মেয়ে, কৈলাস থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতি বছর একবার বাপের বাড়ি আসেন তিনি, আর তখনই আমাদের এখানকার যত অনাচার তা তিনি শক্ত হাতে দমন করেন। তাই উমা কারুর মা, কারুর বোন, আবার কারুর বা মেয়ে...

সাম্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশে দুর্গাপূজা

নাহার আলম (ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ)

'পূজায় স্তব্ধ শরৎপ্রাতের প্রশান্ত নিশ্বাস।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিশেষ এর 'নতুন শ্রোতা ২' উক্তিটি দিয়েই শুরু করছি। শরৎ ঋতু মানেই শ্বেতশুভ্র কাশফুলের সমারোহ, সাথে ঢাকের আওয়াজ। যা মনে করিয়ে দেয় দেবী দুর্গার আগমনী বার্তা। আলোচ্য প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের দুর্গাপূজা'র সাথে শরৎ ঋতুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ, আশ্বিন বা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে (ষষ্ঠ থেকে দশম দিন অব্দি) বাঙালি সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবী দুর্গার শাস্ত্রবিধিত পূজার্চনার প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে দুর্গাপূজা পালিত হয়। এ পাঁচদিন যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, দুর্গাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী, বিজয়াদশমী নামে পরিচিত। বাংলাদেশ, নেপালসহ ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এ উৎসব পালন করেন। অকালবোধন, দেবীপক্ষ, শারদীয়া দুর্গাপূজা, মহাপূজা (শরৎকালীন দুর্গাপূজা), শারদোৎসব, দুর্গোৎসব, বাসন্তী পূজা (বসন্তকালীন দুর্গাপূজা) – এ পূজার

অন্য সব নাম। বিশেষ ঋতু শরৎকালেই কেন এ পূজার আয়োজন হয় তার যৎকিঞ্চিত ব্যাখ্যা জেনে নেওয়া যাক। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গা দেবীকে পূজা করা হয়েছিলো। হিন্দু শাস্ত্রমতে, শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকায় এ সময়টি পূজার জন্যে উপযুক্ত সময় নয়। আর এ কারণেই অসময়ের এ পূজাকে ‘অকালবোধন’ বলা হয়ে থাকে।

উল্লিখিত দুই পুরাণানুযায়ী, রামকে সাহায্য করার জন্যে ব্রহ্মা দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণে আছে, রাম স্বয়ং দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন, যদিও রামায়ণের প্রকৃত রচয়িতা বাল্মীকি মুনি রামায়ণে রামচন্দ্রকৃত দুর্গাপূজার কোনো উল্লেখ করেননি। রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদেও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তথাপি, প্রচলিত তথ্যানুসারে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে শরৎকালেই দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। দুর্গা প্রতিমার বিবরণটি এমন – দেবী দুর্গা সিংহ বাহনা দশভুজা। দশ হাতে দশটি অস্ত্র। অস্ত্রবিদ্ধাবস্থায় পদতলে মহিষাসুর। দেবীর দক্ষিণে লক্ষ্মী ও সিদ্ধির দেবতা গণেশ। বীণাপাণি সরস্বতী ও সেনাপতি কার্তিক বামে তার পাশে কালাবউ মৃত্তিকার অবস্থান। যুদ্ধ সাজে সজ্জিতা দেবী দুর্গা সিংহ ও সাপ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মহিষাসুর বধে উদ্যতা। গণেশ ও কার্তিকের বাহন যথাক্রমে ইঁদুর ও ময়ূর। পাঁচদিনের অনুষ্ঠান হলেও,

এই দুর্গপূজায় মূলত মহালয়া থেকে উৎসবের শুরু হয় এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় তার সমাপ্তি হয়। এ পূজার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ হলো কুমারীপূজা, সপ্তমীতে মহাস্নান এবং অষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হয় সন্ধিপূজা। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মের প্রধান জাতীয় উৎসব।

হিন্দুধর্মীরা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়। বাংলাদেশে প্রথম কবে এ পূজার শুরু তা নিয়ে মত ভিন্নতা রয়েছে। কারো কারো মতে পঞ্চদশ শতকে শ্রীহট্টের (বর্তমান সিলেট) রাজা গণেশ প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেন। কিন্ত এ বিষয়ে তেমন কোনো বিস্তারিত তথ্য নেই। তবে বাংলাদেশে প্রথম দুর্গাপূজা প্রচলন বিষয়ক নানা গবেষকদের তথ্যমতে, মুঘল আমলে রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংস নারায়ণ রায় বাহাদুর (বাংলার বারো ভূঁইয়াদের একজন) ১৪৮০ (৮৮৭ বঙ্গাব্দ) খ্রিস্টাব্দে 'কংস নারায়ণ মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথম এ মন্দিরেই দুর্গাপূজার প্রচলন শুরু করেন। তখন তিনি যাবতীয় ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। এবং এ-ও জানা যায়, তৎকালীন রাজাদের মাঝে নিজের সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রায় নয় লক্ষ (সে সময়কার হিসেব মতে) টাকা খরচা করে এই পূজার আয়োজন করেছিলেন। প্রথম এ পূজায় পৌরহিত্য করেছিলেন রাজপণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী।

একই বছরের বসন্তকালে কংস রাজার সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্যে তাঁর চেয়ে আরও বেশি টাকা ব্যয়ে রাজশাহীর ভাদুরিয়ার রাজা জয় জগৎ নারায়ণ বাসন্তী পূজার আয়োজন করেছিলেন বেশ আড়ম্বরের সাথেই। যদিও বাসন্তী পূজার প্রচলন বাংলাদেশে তেমন আর নেই। এরপরে আঠারো শতকে সাতক্ষীরার কলরোয়ার মঠবাড়িয়ার নবরত্ন মন্দিরে দুর্গাপূজা হতো এমন তথ্যও উঠে এসেছে বিভিন্ন গবেষকদের লেখায়। নবাব সলিমুল্লাহর আমলে সর্বপ্রথম ঢাকায় দুর্গাপূজার শুরু হয়।

অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, পুরোনো ঢাকার সুত্রাপুর অঞ্চলের ব্যবসায়ী নন্দলাল বাবু ১৮৩০ সালে তাঁর মৈসুন্ডির বাড়িতে সবচেয়ে বড়ো দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। খরচের পরিমাণ উল্লেখ না থাকলেও এটি জানা যায় যে, প্রতিমার উচ্চতা ছিলো প্রায় দোতলা বাড়ির সমান। তারও পরে বিক্রমপুর পরগনার ভাগ্যকূল জমিদার বাড়ির রাজা ব্রাদার্স এস্টেটে, সাটুরিয়া থানার বালিহাটির সিদ্ধেশ্বরী জমিদার বাড়িতে, ব্যাপক আয়োজনে দুর্গাপূজা পালনের তথ্যও জানা যায়। সময়টি ছিলো ১৮৫৭ সাল, অর্থাৎ সিপাহী বিপ্লবের বছর। আরমানিটোলার জমিদার শ্রীনাথ রায়ের বাড়ির বিখ্যাত পূজা হয়েছিলো ১৯২২-২৩ সালের দিকে। লালবাগ থানার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজিতা দুর্গার আরেক রূপ দেবী ঢাকেশ্বরী নামেই ঢাকার নামকরণ

করা হয় বলে অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা। মূলত সপ্তদশ থেকে উনিশ শতক অব্দি সামন্ত রাজা ও ক্ষমতাধর জমিদারগণ তাঁদের প্রতিপত্তি, অর্থকৌলিন্যের চমক দেখাতেই দুর্গাপূজার আয়োজনের প্রচলন শুরু করেন। সে সময়ে এই পূজা সবার জন্যে হয়ে উঠতে পারেনি। বিংশ শতকের শুরুর দিকে বাংলাদেশে এই পূজা অভিজাত ও বিত্তশালী হিন্দু সমাজের পারিবারিক পরিমণ্ডলের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলো। ’৪৭ এর দেশ বিভাজনের পর বিত্তশালী ও অভিজাত শ্রেণিদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কমার ফলে এককভাবে পূজার আয়োজন করা ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। যার ফলে একক পূজা প্রচলন থেকে প্রথমে বারোয়ারি এবং পরবর্তীকালে সর্বজনীন পূজার চল শুরু হয়। বর্তমানে এই দুর্গাপূজা দু'ভাবে হয়ে থাকে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্তরে সামাজিকভাবে এবং পাড়া স্তরে বারোয়ারি বা সর্বজনীনভাবে।

বাংলাদেশে প্রতিবছরই পূজা মণ্ডপের সংখ্যা বাড়ছে। ’২০ ও ’২১ সালে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির তথ্য মতে, সারাদেশে দুর্গাপূজার মণ্ডপের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ত্রিশ হাজার দু’শো তেরো এবং বত্রিশ হাজার এক’শো আঠারোটি।

পিতৃপক্ষের অবসান এবং দেবীপক্ষের সূচনার মধ্য দিয়ে মহালয়ার ক্ষণ শুরু হয়। তারপর চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে দেবীর আবাহন কার্য সম্পন্ন করা হয়। চণ্ডীপাঠের মাধ্যমেই দেবী

দুর্গাকে মর্ত্যলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাঁচদিন ব্যাপী পূজার আয়োজনে বোধন ও অধিবাসের পর মূল পূজা শুরু হয় মূলত সপ্তমী থেকে। পূজার উপকরণাদিতে থাকে চাল, দুর্বা, ফুল, চন্দন, নানা জাতের ফল ইত্যাদি। হিন্দুরা এ সময় সাধ্যমতো নতুন পোশাক, নানা জাতের মিষ্টান্ন ও খাবারের আয়োজন করে থাকে ঘরে ঘরে। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই নতুন পোশাক পরে পরিবার-বন্ধু স্বজন নিয়ে দেবীকে দর্শন এবং পূজার জন্যে বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিটি মন্দিরে পূজার পাশাপাশি থাকে সাংস্কৃতিক নানা আয়োজন। পত্র-পত্রিকাগুলো বিশেষ সংখ্যা বের করে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা।

বাংলাদেশে দেশভাগের আগে ও পরে আশির দশক পর্যন্ত শারদীয় দুর্গোৎসবে পূজার পাশাপাশি মণ্ডপে মণ্ডপে যাত্রাপালা কীর্তন, কবিয়াল বা পালাগান এসবই ছিলো বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সন্ধ্যারতির পর শুরু করা হতো যাত্রা বা পালাগানের অনুষ্ঠান, দেখতো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষেরা। যাত্রাপালা বিষয়ক স্মৃতিকথায় যাত্রাপালার সম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র (১৯০৭-১৯৭৬)'র কিছু কথা উল্লেখ করছি এখানে – 'সন্ধ্যাবেলা পালা আরম্ভ হতো। শেষ হতো ভোর বেলায়, কাক ডাকলে... পালাগুলো ছিল অত্যাধিক দীর্ঘ। কেউ বক্তৃতা আরম্ভ করলে সহজে ছাড়তো না।' এই

যাত্রাপালা ছিলো এদেশের সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ড. মুনতাসীর মামুনের ‘দুর্গা পূজা’ শীর্ষক প্রবন্ধের কিছু কথা ছিলো এমন – ‘বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা ও গৌরীপুর জমিদার বাড়িতে যে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হতো তাতে প্রধান আকর্ষণই ছিল যাত্রা। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তিনদিন ধরে মন্দির চত্তরে বসতো যাত্রার আসর। দেশীয় যাত্রাদলের পাশাপাশি কোলকাতার দলগুলোকেও বায়না করে আনা হতো।’ ষাঠের দশকে ঢাকার কাওরান বাজারের পালপাড়া গ্রামের বারোয়ারি পূজায় সারারাত যাত্রাপালার আসর চলতো। রাজবাড়ি জেলার রামদিয়া ও পার্শ্ববর্তী বহরপুর গ্রামের মন্দিরেও বসতো যাত্রাপালার আসর।

’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় আরপি সাহার বাড়িতে এমনই এক দুর্গাপূজায় প্রথম বিপ্লবী পালা ‘একটি পয়সা’ মঞ্চস্থ হয়েছিলো। এছাড়া ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী আমলে সিলেটের চা-বাগান ও হাওড় অঞ্চলে দুর্গাপূজায় যাত্রাগানের আসর হতো। আশির দশকে এসে গ্রাম ও শহরের মানুষের কাছে বিনোদনের এই ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি ধারার বদল ঘটে। যাত্রা, কবিয়াল, কীর্তন ও পালাগানের পরিবর্তে জায়গা করে নেয় আধুনিক বাংলা গান ও বাংলা সিনেমার গান, হিন্দি গান, বাংলা রক

গান, ব্যান্ডের মতো সঙ্গীতগুলো। মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁওয়ে উপমহাদেশে একমাত্র লাল বর্ণের দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। প্রায় তিনশো বছরের পুরোনো এই লাল বর্ণের দুর্গা দেবীকে দেখার জন্যে দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য দর্শনার্থীরা আসেন।

মাঙ্গলিক শঙ্খ নিনাদ, কুলবধূদের উলুধ্বনি, ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঘণ্টার ঐকতানের সাথে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণে মহা সমারোহে চলে দেবীর পূজার্চনা। ভোর থেকে শুরু হয়ে প্রসাদ বিতরণ চলে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। দরিদ্রদের সাহায্য দেওয়া হয়। দেবীর আরতি করা হয় সন্ধ্যা থেকে রাত অব্দি। বিজয়া দশমীতে ধূপ, দীপ, পাখা ইত্যাদি দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এ সময় ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু নারী-পুরুষদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

বিসর্জন শেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই সবরকম ভেদাভেদ ভুলে সৌহার্দ স্থাপনের লক্ষ্যে একে অপরের মঙ্গল কামনায় পরস্পর পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়, প্রণাম ও কোলাকুলি করে থাকে। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে দেবী দুর্গা পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার। যাঁর অপর নাম ভগবতী দুর্গা। ভগ হলো – ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি ঐশ্বর্যের নাম। দুর্গা দেবীর অনেক নাম যেমন: মহাকালী, মহামায়া, মহালক্ষ্মী, শ্রী চণ্ডী, মহাসরস্বতী ইত্যাদি। তিনি দুর্গ নামের এক দৈত্যকে বধ

করে দুর্গা নামে খ্যাত হন। অসুর নিধন ও শত্রু বিনাশে দেবী দুর্গা যেমন ভয়ঙ্করী তেমনি তাঁর ভক্ত ও সন্তানের কাছে মমতাময়ী জননী, কল্যাণ প্রদায়িনী। রবি ঠাকুর এই দেবী দুর্গা সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ।/ দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র আগুনবরণ।’

বাংলাদেশে বিজয়া দশমীর দিন সর্বসাধারণের জন্যে সরকারি ছুটির দিন। আনন্দ, উৎসবের কোলাহলে পূজার দিনগুলোতে হৈ-হুল্লোড়ে আবালবৃদ্ধবনিতারা মেতে ওঠেন। সাম্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এই সবুজ সোনার বাংলাদেশ। এখানে সবার মুখে মুখে থাকে একতার সেই স্লোগান, ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ এদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলা এমন মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই সব ধর্মীয় উৎসব একসাথে পালন করাটা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। ■

হস্তাঙ্কন
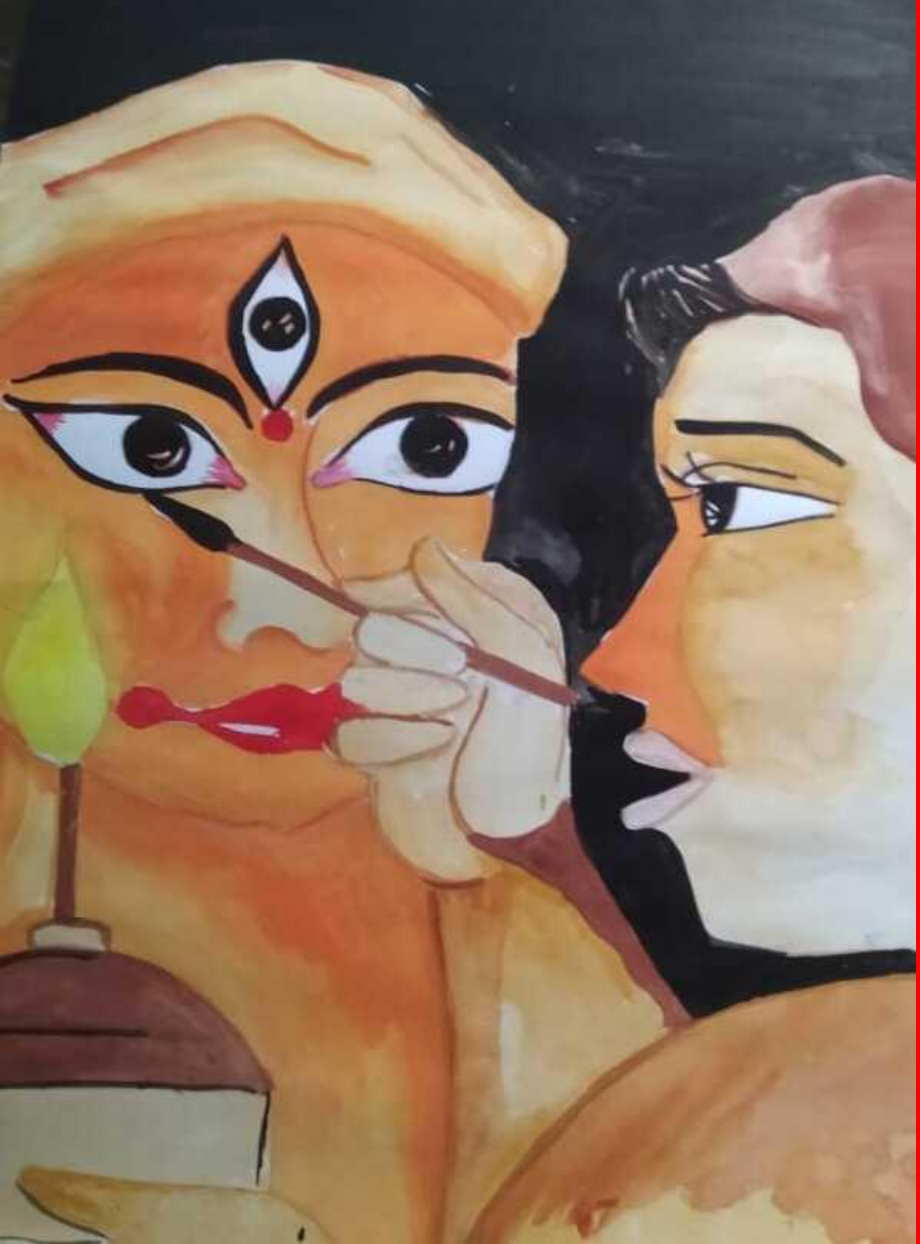
ছবির নামঃ চক্ষু দান...

শিল্পীঃ রুদ্র দাস ✧ বয়সঃ ১২ বছর

কেন আসিস মা?

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

"মা, টুসি মাসী কবে আসবে?" "সময় হলেই আসবে," মা উত্তর দিল। "কিন্তু মা, দুর্গাপূজা তো এসে গেল। টুসি মাসি না এলে আমরা নতুন জামা-প্যান্ট পাবো কি করে?" মেয়ের এই কথা শুনে বিলাসীর বুকের ভিতরটা কিরকম চিনচিন করে উঠল। আজ দু-বছর হল লোকটা ঘরে শুয়ে আছে। বেশি নড়াচড়া করতে পারে না। খুব ভালো রাজমিস্ত্রির কাজ করত। উঁচু উঁচু বিল্ডিংয়ের ফ্রন্ট এলিভেশানের কাজ খুব ভালো জানত। বড় বড় কন্ট্রাক্টরবাবু ফ্ল্যাট তৈরী করার সময় ডেকে ডেকে কাজ দিত। প্রচুর টাকা উপার্জন করত। সংসারে কোন অভাব ছিল না। শেষ কালে নিজেই কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। একদিন মাথা ঘুরে উঁচু ভাড়া থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে গেল। যদিও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটু আধটু চলাফেরা করতে শুরু করেছিল, তারপর হঠাৎ করে একদিন ষ্টোক হয়ে গেল। দু' মাস হাসপাতালে পড়ে ছিল। এখন বলতে গেলে সে প্রায় পঙ্গু। এক সহৃদয় কন্ট্রাক্টরবাবু কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন,

সেই অল্প সুদের টাকা আর পাঁচ বাড়ি কাজ করে কোনরকমে আধপেটা খেয়ে দিন চলে বিলাসীদের। উপার্জনের অর্ধেক টাকা ঔষধ কিনতে চলে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবুঝ মেয়েকে সে বলল, "হ্যাঁ মা, টুসি মাসী জামা-প্যান্ট নিয়ে আসবে তো..."

"কি মজা, কি মজা!" করে মেয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল আর বিলাসী কাপড়ের খুট দিয়ে চোখের জল মুছে রান্নার ব্যবস্থা করতে গেল।

কালনা জেলার সাতপুকুর এলাকার সুজানগরে এক দরিদ্র পরিবারে বিলাসীর জন্ম। বাবা পরের জমিতে ফসল ফলিয়ে কিছু ধান আর টাকা নিয়ে সংসার চলাতেন। অতি কষ্টে ক্লাস এইট পর্যন্ত বিলাসী লেখাপড়া করেছে। তাকে দেখতে খুব একটা ভালো না হলেও খুব গায়ে-গতরে চেহারা ছিল। এক কথায় খুব যৌবনবতী ছিল। গ্রামের অনেকে লোলুপ দৃষ্টিতে হা করে তাকিয়ে থাকত। এ'হেন বিলাসীর বিয়ে হয়ে গেল কালীপদর সঙ্গে। বিয়ের দু-তিন বছরের মধ্যে একটি মেয়ে ও একটি ছেলের মা হলো বিলাসী। রাজমিস্ত্রি হলে কি হবে, দেড় কাটা জমি কিনে একটা ছোট্ট বাড়ি করেছিল কালিপদ। খালি ছাদটা দিতে পারেনি। অ্যাসবেস্টস চাল লাগিয়েছিল। কথা ছিল পরের বছর টাকা জমিয়ে ছাদ ঢালাই করবে। সে আশা আর পূর্ণ হল না। তার আগেই দুর্ঘটনা ঘটল। মানুষের জীবনে সুখ

সবসময় সয় না, বিলাসী মনে মনে ভাবল।

পাঁচ বাড়ি কাজ করে বিলাসী যখন বাড়ি ফেরে, কষ্ট করে জড়িয়ে জড়িয়ে কালিপদ বলে, "আজকে আমার জন্য তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে। তোমাকে সুখী করতে পারলাম না, উল্টে বোঝা হয়ে দাঁড়ালাম।"

বিলাসী কালীপদর মুখে হাত চেপে বলে, "ওরকম অলক্ষুনে কথা আর বলবে না, আমার কোন কষ্ট নেই। উঠে বস দেখি, আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি।"

দু'দিন পর ভাঙ্গা টেপা মোবাইলে টুসির ফোন এল। ধরা ধরা গলায় টুসি বলল, "দিদি ওর মিলটা লকআউট হয়ে গেছে। পুজোর আগে কি বিপদে যে পড়লাম এক ভগবান ছাড়া আর কেউ জানে না।" কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "দিদি এবারে ওদের জন্য জামা-প্যান্ট নিয়ে যেতে পারবো না। তুমি দুঃখ পেয়ো না। বোনাসটা পেলে না হয় ওদের ভাই-বোনের জন্য জামা-প্যান্ট নিয়ে যেতাম। সেটাও কোম্পানি দিল না। সব ঠিকঠাক থাকলে সামনের বছর বেশি করে দেব। তোমাকেও একখানা কাপড় দেব দিদি। তুমি আমাকে মাফ করো দিদি।"

বিলাসি বলে উঠল, "চুপ কর বোন, ও কথা বলিস না ফি বছর জামা-প্যান্ট দিস, এবারে দিতে পারিসনি তো কি আছে, তা বলে কি দিদি বোনের সম্পর্কে ভাটা পড়ে যাবে নাকি রে? সেটি আমি হতে দিব না। দুই বোনে ফোনে এক

প্রস্ত কান্নাকাটি হয়ে গেল।

পরের দিন গ্রামের পুজো কমিটির কাছে ছুটে গিয়েছিল বিলাসী। বলেছিল আমার ছেলে-মেয়ে দুটির জন্য যদি জামা-প্যান্টের ব্যবস্থা করা যায় দেখুন না দাদারা।

“না রে বিলাসী, এবারে হবে না। আগে বললে তবুও কিছু একটা ব্যবস্থা করা যেত। আমাদের একদম ছোট ক্লাব। কোন আয় নেই। বস্ত্রদানের সব নাম-ধাম লেখা হয়ে গেছে। এবারে হবে না রে বিলাসী। গত বছর তোকে একটা শাড়ি দিয়েছিলাম। পরের বছর নিশ্চয়ই করে দেব।” ভগ্নহৃদয়ে বিলাসী ঘরে ফিরে এসেছিল।

পুজোর সময় কাজের বাড়ি থেকে যেটুকু বোনাস পেয়েছিল কালীপদকে ডাক্তার দেখাতে, বিভিন্ন ধরণের টেস্ট ও ঔষধে খরচ হয়ে গেছে। আগে জানলে কয়েকটা টাকা বাঁচিয়ে ছেলে-মেয়েকে যাইহোক তাইহোক করে জামা কিনে দেওয়া যেত।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল দত্ত গিন্নি তো বোনাসের টাকাটা আজকেই দেবে বলেছে। পাঁচ বাড়ির মধ্যে দত্ত বাড়ির কাজটা বিলাসী পুজোর পর ছেড়ে দেবে ঠিক করেছে। আগে থেকে জানালে বোনাসের টাকাটা পাওয়া যাবে না। দত্ত গিন্নির ভয়ানক ছুঁচিবাই। সবসময় বলে হাত ধোও, পা ধোও, শাড়ি পাল্টে আমার বাড়িতে আসবে। আর কর্তাটি পাক্কা শয়তান। যতক্ষণ কাজ করে বিলাসী ততক্ষণ লোলুপ

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গিন্নি একটু এদিক ওদিক হলে বা ছাদে গেলে অমনি রান্না ঘরে এসে ছুঁকছুঁক করে এনিয়ে বিনিয়ে একথা সেকথা বলে গায়ের কাছে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ে। একদিন বিলাসী মুখ দিয়ে মদের গন্ধ পেয়েছিল। তাই বিলাসী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে পুজোর পর দত্তবাড়ির কাজটা পাকাপাকিভাবে সে ছেড়ে দেবে।

কালিপদকে খাইয়ে-দাইয়ে কোমরে শাড়ির গোছাটা গুজে হনহন করে দত্ত বাড়ির দিকে সে রওনা দিল। বেলা একটা নাগাদ দত্ত গিন্নি আসতে বলেছিলেন। কলিং বেল বাজাতে দরজা খুলে কর্তাবাবু বললেন, "আরে তুমি, এস এস..." বিলাসী ভিতরে ঢুকতেই দরজাটা আঁটোসাঁটো করে বন্ধ করে দিলেন বাবু। বিলাসী খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "গিন্নি মা?"

দত্তবাবু বললেন, "এই একটু দোকানে বেড়িয়েছে।" বিলাসী সঙ্গে সঙ্গে "আমি যাই, পরে আসব" বলে যেই পা বাড়িয়েছে তখন কর্তা বলে উঠল, "কি জন্য এসেছো সেটা তো বললে না!"

"আজ্ঞে না, মানে গিন্নি মা আজকে এই সময় আসতে বলেছিলেন। আজ যে বোনাসের টাকাটা দেবেন, তাই এসেছিলাম।"

"কত টাকা?" কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ্ঞে ঐ এক মাসের মাইনে, মানে দেড় হাজার টাকা।"

"তুমি এক কাজ করো এসেই যখন পড়েছো, এক কাপ লিকার চা করে খাওয়াও, আমি টাকাটা দিচ্ছি।"

"না থাক, গিন্নিমার থেকে নেব।"

"আরে বাবা, এসেছ যখন টাকাটা নিয়েই যাও না। আমি গিন্নি মাকে বলে দেব। যাও দেখি চা-টা বানিয়ে নিয়ে এসো দেখি, আমি টাকাটা বার করি।" অগত্যা বিলাসী নিরুপায় হয়ে চা বানাতে গেল। চা করে ঘরে গিয়ে চা-টা দিতেই কর্তা চা টেবিলে রেখে মানি ব্যাগ থেকে দেড় হাজারের বদলে দু'হাজার টাকা বিছানার পাশে রেখে বিলাসীকে সপাটে জাপটে ধরল। বিলাসী ফোঁস করে বলে উঠল, "শয়তান ছাড়্ ছাড়্ বলছি, আমি তোর মতলব বুঝি না?।"

কিন্তু কর্তা বিলাসিকে জোরপূর্বক বিছানায় ফেলে দিল। বিলাসী দারুণভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু পুরুষ মানুষের জোরের কাছে পেরে উঠল না। দত্তবাবু ক্রমশ বিলাসীর সর্বস্ব লুটে নিল। অসহায়ের মত আত্মসমর্পন করা ছাড়া বিলাসীর আর কিছু করার ছিল না। বিধস্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাপড়-জামা ঠিক করবার সময় কর্তা দু-হাজার টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "কাউকে কিছু বললে তোমার সর্বনাশ করে ছাড়ব।"

দত্তবাড়ির থেকে বেরিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বিলাসী মনে মনে বলল, "গরীবের কথা কেউ বিশ্বাস করে না গো, বিশেষ করে কাজের মেয়ের কথা। যাদের

টাকা নেই, তাদের কিছু নেই, মান-সম্মান নেই, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সত্যি কথাটা বললেও কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। উল্টে বলবে, তুমি দুপুর বেলা বাড়িতে কেউ না থাকাকালীন গিয়েছিলে কেন? তুমি দুশ্চরিত্রা। গরীবের কথা কেউ শোনে না, বিশ্বাস করে না। থানা পুলিশ, কোর্ট কাছাড়ি, পাড়ার লোক, এমনকি জ্ঞানী গুণী সহৃদয় ব্যক্তি যিনি সুবিচার, ন্যায্যবিচার করেন তিনিও বলবেন, কেন গিয়েছিলিস মা, কাজটা তুই ভালো করিসনি। কাউকে কিছু বলতে গেলে উল্টে চার বাড়ির কাজটাও তার চলে যাবে। অসুস্থ স্বামী, ছেলেপুলেকে নিয়ে না খেতে পেয়ে মরতে হবে। গরীবের কথা শুধু ভগবান শোনেন।" এইটুকু বিশ্বাস খালি বিলাসীর আছে।

বাড়িতে ফিরে স্বামীকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে কেঁদেছিল। অসহায়ভাবে কালিপদ বিলাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে কারণটা বোঝার চেষ্টা করছিল, হয়তো বুঝেও চুপ করে ছিল, কারণ কিছু করার উপায় তার কাছে ছিল না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লুন্ঠিত ইজ্জত বেচার টাকা দিয়ে ছেলেমেয়ের জন্য সুন্দর দুটি জামা প্যান্ট কিনে দিল সে। একরাশ দিলখোলা খুশি নিয়ে ছেলে-মেয়েরা মাকে জড়িয়ে যখন চুমু খাচ্ছে, তখন বিলাসীর চোখ দিয়ে টস টস করে অশ্রুধারা বয়ে চলেছে।

ছেলে-মেয়েকে নিয়ে পূজা প্যান্ডেলে গিয়ে মৃন্ময়ী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "ফি বছর কেন আসিস মা! আমাদের মত গরীবদের কষ্ট দিতে? এই বাচ্ছাগুলোর মুখে যদি হাসি ফোটাতে না পারিস, তাহলে কিসের জন্য আসিস মা?" মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী মুখমন্ডলের ত্রিনয়ন থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতি যেন বিলাসীকে আলোকিত করে দিল। এক অদ্ভূত ধরণের শিহরণ বিলাসীর সারা শরীর দিয়ে বয়ে গেল। এটা যে চরম প্রাপ্তি সেটা কেউ না বুঝলেও বিলাসী ঠিক বুঝল। এক অদ্ভূত শান্তি নিয়ে বিলাসী ঘরের দিকে পা বাড়াল।

(গল্পটি লেখকের সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যদি কোন স্থান, কাল, পাত্র, পাত্রীর সঙ্গে এর কোন মিলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলে তা একান্ত অনিচ্ছাকৃত।) ■

মা-কে মনে পড়ে

গোবিন্দ মোদক

দাদু আমি তোমার সঙ্গে যাবো কুমোর বাড়ি,
দেখবো কেমন তৈরি করে ঠাকুর সারি সারি !
দেখবো কেমন করে ঠাকুর অতো সুন্দর হয়,
কুমোর দাদু বিরাট জাদু জানেন তো নিশ্চয় !
কোনোদিন তো দেখিনি আমি দুগ্গা ঠাকুর গড়া,
আজকে আমি যাবোই যাবো, করে নিয়েছি পড়া...

অগত্যা তাই নাতিকে নিয়ে এসে কুমোরবাড়ি,
দাদু দেখায় কেমন করে মাকে পরায় শাড়ি !
কেমন করে তুলি দিয়ে করে প্রতিমার রং,
নানা ভঙ্গির নানা ঠাকুর, নানান তাদের ঢং !
কেমন করে যত্নে আঁকে দুগ্গা মায়ের চোখ,
যে চোখ দেখে মানুষ ভোলে সকল দুঃখ-শোক...

অবাক হয়ে নাতি দেখে তুলির চমৎকার,
একটু একটু করে ফোটে মায়ের রূপ বাহার !
টিকালো নাক, টানা চোখে দুগ্গা রূপের ডালি,
অবাক হয়ে নাতি সেসব দেখেই যায় খালি !
একসময় বিভোর হয়ে নাতি বলতে থাকে,
"দুগ্গার রূপ দেখে আমার পড়ছে মনে মাকে"... ■

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা ফল্‌স...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

চতুষ্কোণ

চৈতি চক্রবর্তী (বাংলাদেশ)

(১)

ঝোপের আড়ালে থাকা লাশেদের কোনো ঠিকানা হয়তো সত্যি হয় না। তাই তো বেওয়ারিশ লাশের গায়ে কিছু পশুদের ছাপ রক্তকে অপবিত্র করে দেয়। অথচ সেই বিন্দুতেই নরপিশাচের জন্ম। তাদের ঘরেও এমন এক একটা শরীর ঘুরে বেড়ায়। তাতে আঁচ লাগলে সেই নরপিশাচরাই আবার দল বেঁধে এজলাসে গিয়ে ন্যায় চায়। শেষপর্যন্ত তারা জিতেও যায়। কলমি লতারা যদি বা ছাড় পায় কোর্টের ব্যারিকেডে তাদের আরো নগ্ন কথার অত্যাচারে ঠোঁট নীল হয়। এক একটা গল্প আবার একটু অন্যরকম। তারা কেউ কাকা, জ্যাঠা, দাদু নামক ভদ্র সম্পর্কের জামায় মহীয়ান। চোখের সামনে মুখোশ পরা ঘর শত্রু বিভীষণ। কিছুই করার নেই। যে পাত্রে খাবার তার আবার নোংরা কি? সবটাই গলাধঃকরণ। ভুল ঠিকানার কোনোই কমতি নেই। তাই তো এক মা ভীত হয়ে যায় যখন সে শোনে — ”এখনো তো কিছুই করিনি।” কপালের কথা ভেবে শিউরে ওঠে ভেতরে ভেতরে। বলবে কাকে। জন্মদানের মতো

কাজটা যে তার নিজেরই, তাই সবটুকু দোষ তাকেই গায়ে মাখতে হবে। স্বামী স্বশুর, ভাসুর, দেওর এমনকি নিজের রক্তের সম্পর্কগুলোও অচেনা তখন। একটা গুমরে মরা জীবন যেখানে ছাড় নেই, শেয়ার নেই, সফলতা নেই, শুধুমাত্র পাওনা গঞ্জনা গঞ্জনা আর -----গঞ্জনা।

(২)

অমল, রাধু, আর শ্যামল ঠিক করলো একটা প্ল্যানচেট করা যাক। সবেই কিছুদিন হল মা গত হয়েছেন। তাঁকে ডাকলে কেমন হয়? অমল বড় ছেলে সে মাকে ভীষণ ভালোবাসত। মন্দ হবে না যদি মায়ের সাথে একবার কথা বলা যায়। ডাকা হল।

"প্রথমেই লিখলেন, আমাকে তোরা ডেকে এনে কষ্ট দিচ্ছিস বড্ড। আর কখনো ডাকবি না, বল এবার কেন ডেকেছিস?"

অমল আমতা আমতা করে বলে, "তুমি ওখানে কেমন আছো মা?"

"এখানে ভালো আছি। তোদের মায়া ত্যাগ করে এসে একটা আশ্রয় পাবার চেষ্টায় আছি যা এত সহজে পাওয়া যায় না। তবে তোর মায়াটা ছাড়তে পারিনি রে অমল। আমি ফিরব তোর ছোট ছেলে হয়ে তোর ঘরে।"

সবাই শুনলেও কেউ ঠিকঠাক যেন বিশ্বাস করতে পারল না। যখন সবাই ভুলেই গেছে সেকথা তখন সত্যি অমলের

ঘরে ছোট ছেলে এল। আর যাই হোক, আত্মারা বোধহয় এখনো হাইটেক মিথ্যে বলতে শেখেনি। নাহলে তারাও বোধহয় মন্ত্রী আমলা হয়ে যেত।

(৩)

প্রফেসর সলিল ঘোষ ক্লাসে ঢুকেই বললেন, "শোন আজ আমি পড়াব না। একটু অন্য কথা বলব।"

অনেক তোমাদের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া নিয়ে পড়িয়েছি। ওগুলো হল বইতে লেখা কিছু পুরনো কথা। আজ যেটা বলতে চাই তা হলো আগেকার দিনের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো ছিল সেকেলে, মডার্ন হতে পারেনি। কিন্তু আজ তারা আলট্রা মডার্ন। নানান কারিগরী শিখে সভ্য ভদ্র হয়েছে। তাদের আবার প্রকারভেদ ও বেড়েছে। যেমন — মনুষ্য সমাজে কোয়েডুকেশন জাতির মান্যতা বেড়েছে। পরকীয়ার স্বীকৃতি হয়েছে। ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসও কম যায় না তাদের বংশবৃদ্ধিতেও কিছু পরকীয়া নিশ্চই আছে। নাহলে তারা অজানা অচেনা নামের রোগ ছড়াচ্ছে কিভাবে? আমরা নিজেদের চালাক ভেবে এগোচ্ছি, ওরা কিন্তু মোটেই পিছিয়ে নেই। নাহলে শরীরের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকে কি করে? আমরা জানি রোগের সিম্পটম দেখেই রোগীর রোগ ধরা যায়। অথচ আজকাল রোগীর রোগে অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না। এরা যেন সেই পরকীয়া প্রেমিকদের মতো, ঘরের খাব বনের কুড়াব

কিন্তু ধরা দেব না। এদের নতুন নাম পরকীয়া ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া হলে আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য হব না। তোমরা যারা এখন ক্লাসে আছো শুনছো তারাই পরবর্তীতে এসব ফেস করবে। তাই আগে থেকেই সাবধান করে দিলাম। ডিজিটাল দুনিয়ার রোগ ভোগ নিয়ম-কানুন আচার আচরণ কিছুই সেকেলে হিসেবে মেলাতে যেও না। তাহলে রোগি বা রোগিনী কেউই ফিস দেবার জন্য তোমাদের আস্তারে থাকবে না। ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া কবলিত হয়ে তাদের গুণগান করবে। সাবধান! সাবধান! হাইটেক ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া থেকে সাবধান।

(৪)

আজকের যুগে ধীরে ধীরে কালি কলমের হিসেব উঠতে বসেছে। সবটাই হচ্ছে আঙুলের ডগায়। আগের হিসেব ছিলো প্রথমে চক পেন্সিল, তারপর কাঠের পেন্সিল, তারপর পেন। এখন সেটা আর তিন আঙুলে না ধরে যে কোনো আঙুলেই টাইপ করা চলে। হাইটেক কা কামাল। আগে টাকা তোলা হতো উইথড্রয়াল স্লিপে। এখন হয়েছে এ টি এম। আগে ছিল চিঠি, এখন ই-মেইল। আগে ছিল ল্যান্ড ফোন, এখন মোবাইল। আগে ছিল খাতা এখন মনিটার স্ক্রিন।

আপনি মশাই যতই শাড়িতে পড়ে থাকুন দুনিয়া পৌঁছে গেছে বিকিনিতে। টি আর পি বাড়ানোর জন্য কৃষকের হাল

ধার করা হচ্ছে। আর্টিফিসিয়াল দুঃখকে পয়সা দিয়ে কেনা হচ্ছে। জেনে বুঝেও আমরা মজা লুটছি। আমরা পাবলিক যখন খুশি ভোল পাল্টে সঙ সাজতে পারি। পাশের বাড়ির ভোলার ছোট হয়ে যাওয়া জামাটা দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছি। মরার খাট কাঁধে নিয়ে সেলফি তুলছি। একটা মেয়ের ইজ্জতকে এনক্যাশ করছি। পাবলিক হাততালির বহরে গর্বিত। সবকিছু দেখে শুনেও মহাত্মার তিন বাঁদরের পথ ধরে শুনিনি, দেখিনি, বলিনি গোছের ভূমিকায় আমরা অটল। মানেটাও নিজেরাই তৈরি করেছি।

ওরে ভোলা পাগলপারা, কলমের ব্যবসা ছেড়ে আঙুলে লেখা কবিদের পাবলিসিটি এনক্যাশ কর। কলমটা এখন সরস্বতীর আঁচল ছেড়ে ব্যবসায় নেমেছে। সবটাই রূপান্তর। নয়তো হাইটেক। ■

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ হলং এর ডাইরি...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

এ জীবন চাইনা

মৌ বিশ্বাস

শুঁয়োপোকার মত শুধু কচি পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে
চলে যাওয়া জীবন আমি চাইনা,
আমি একটা সুন্দর জীবন চেয়েছিলাম,
যে জীবনে তুমি থাকতে শুধু কবিতার পাতা হয়ে,
যে জীবনে তুমি থাকতে অমলের জানলা হয়ে,
যে জীবনে ধাক্কা লাগে লাবণ্যর গাড়ির সাথে অমিতের,
যে জীবনে নাটোরের বনলতা সেনকে পাওয়া যায়।
তবুও প্রতিদিন বেঁচে থাকতে হয়,
তবুও প্রতিদিন তাকিয়ে থাকতে হয় তোমার মুখের দিকে,
সেটা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।
একটা দীর্ঘশ্বাসে তুমি আমার অভিমান বুঝে নিতে,
ঠিক যেমন জ্বরের সময় বাবা কপালে হাত রাখে।
এই শুঁয়োপোকার জীবন নিয়ে কি করবো আমি?
তার থেকে একদিন গুটি বেঁধে প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাওয়াই ভালো।।

উৎসর্গ- বিখ্যাত লেখক আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে... ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ ঠাকুর গড়া...

চিত্রগ্রাহকঃ সোহম মন্ডল

দুর্ভাগ্য

প্রণব কুমার বসু

সুনন্দা আর পারছে না। আজ ছুটির দিন তবুও সেই সাতসকালে উঠতে হয়। ছ'টা বাজতে না বাজতেই কলিং বেলের আওয়াজ... একজন দুধের প্যাকেট দিতে আসে আর অন্যজন পেপারওয়ালা। অবশ্য অতিমারী শুরু হওয়ার পর থেকে কেবলমাত্র শনি ও রবিবার পেপার নেয় অরু। অন্য দিনগুলো ল্যাপটপেই পেপার পড়ে নেয় সে। সুনন্দা কতবার বলে এই দু'দিনের পেপারটা বাদ দিতে, কিন্তু কে কার কথা শোনে! আসলে সুনন্দা বুঝতে পারে যে সময় কাটানোর জন্যই অরু পেপারটা বন্ধ করতে চায় না।

মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির সেলস্ ডাইরেক্টর অরুনাভ মজুমদারকে সপ্তাহের অন্য পাঁচদিন সকাল থেকে রাত অবধি অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। শনিবার ও রবিবার সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে চায় সে। অবশ্য ডাক্তারও বলেছেন... যাক সেসব কথা...

এইতো আজই সুনন্দা চা করে মুখের কাছে নিয়ে যাবার পর ঘুম থেকে যখন উঠল, তখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। সে উঠেই আবার সুনন্দার হাতটা টেনে ধরে বলে, একটা

গান করতে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ সারতে প্রায় আড়াইটে বেজে গেল। আজ আবার মেড-সারভেন্ট ডুব দিয়েছে। রান্না, ওয়াশিং মেশিনে জামাকাপড় কাঁচা, খাবার পর বাসন ধোয়া এসব করতে সময় লাগে।

ঘুম থেকে উঠতে উঠতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। উঠে অরুর সঙ্গে বসে চা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ড্রইং রুমে বসে টিভি দেখছে সুনন্দা। শনি রবিবার প্রোগ্রাম বেশ ভালোই থাকে। অরু নিশ্চয়ই বেডরুমে ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনছে আর ড্রিঙ্ক করছে। কিছুতেই অভ্যাসটা ছাড়াতে পারছে না সুনন্দা। মাঝে মাঝে ওকেও অরুর সঙ্গ দিতে হয় যদিও খুবই অল্প মাত্রায় – অরুর একটা গুণ আছে কখনও জোর করেনা নেশার ব্যাপারে কাউকে সেটা কোনও বন্ধু হোক বা সুনন্দা। ঘর থেকে অরু একবার সুনন্দাকে ডাকল

গলার আওয়াজটা কেমন যেন .....

“এতবার কলিং বেল বাজছে শুনতে পাওনি?”

“কই নাতো!” সুনন্দা ড্রইং রুমেই বসে টিভি দেখছে আর কলিং বেলটাওতো ওখানেই বাজে।

“ঐ দেখ আবার বাজছে...”

“তুমি বোধহয় ভুল শুনেছ।”

“তোমায় যেতে হবেনা - আমি দরজা খুলে দেখছি।”

অরু গেটটা খোলার জন্য এগিয়ে গেল। সুনন্দাও ওর সঙ্গে গেল।

"কোথায় কেউ নেইতো - তাহলে বোধহয় ফিরে গেছে।" কথাটা শেষ করেই অরু চলে গেল সোজা ব্যালকনিতে। "ঐ তো... ঐ তো! অংশু ফিরে যাচ্ছে গাড়ি নিয়ে আবার কবে আসবে কে জানে!"

সুনন্দা প্রায় জোর করেই অরুকে ঘরে নিয়ে এসে বলল, "কাল থেকেতো আবার সকাল থেকেই কাজ। আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব।" অরু আপত্তি করেনি।

শোবার অল্পক্ষণের মধ্যেই অরু ঘুমিয়ে পড়েছে। সুনন্দা সন্তর্পণে ড্রইংরুমে গিয়ে ডাক্তার সান্যালকে ফোন করে কী ঘটেছে সন্ধ্যেবেলায় সেটা জানায়। ডাক্তার সান্যাল বললেন, "ঠিক মতো রোজ ওষুধ খাওয়াবেন। আর আজকের তারিখে আপনাদের একমাত্র ছেলে অংশুমান গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। সেজন্য এই হ্যালুশিনে..." বাকি কথা আর শুনতে পারেনি সুনন্দা। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

ছবিতে হাওড়ার দুর্গাপূজা – ১৪২৯

রিত্বিকা চ্যাটার্জি (বয়স ১৩ বছর)

যদিও এইবারে দুর্গাপূজার দিনগুলিতে বৃষ্টির বিরাম নেই, কিন্তু তাতে হাওড়াবাসীর ঠাকুর দেখতে বেরনোর ইচ্ছায় বা প্রয়াসে কোন ভাটা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আমার উৎসাহ তো এতটুকুও কমেনি বরং বেড়েছে। দিনের বেলায় বা সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়লেও বাবা আর মা'র সাথে প্রতি রাতেই ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি।

এবারে বেশ অনেক রকম বিষয়বস্তুর (theme) উপর নির্ভর করে হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্গা প্রতিমা এবং মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছে। করোনা-কালের পর এবার যেন হাওড়ার পুজোতে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে।

আমরা জ্ঞান হয়ে থেকেই তো থিমের পুজো দেখছি, কিন্তু এবারের থিমগুলো যেন একটু বেশি করে ভাল লাগছে। এর কারণ হচ্ছে, আমরা আজকের ছেলেমেয়েরা অনেক কিছুই জানি না, বইতে কিছু কিছু জিনিস পড়লেও তা নিয়ে খুব একটা ভাবি না। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য তাঁতশিল্প আজ বিলুপ্তির পথে, অনেক জায়গাতেই পুজোর থিমে তা দেখানো হয়েছে। আমরা স্কুলের বইতে পরিবেশ দূষণের কথা পড়ি, কিন্তু তা এবার পুজোর মণ্ডপের গঠনের মধ্যে দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এগুলো আমাকে তো ভাবাচ্ছেই, হয়ত বা আরও অনেকের মনেই এই ব্যাপারগুলো রেখাপাত করবে! ■

পরিচালনায়ঃ চিত্তরঞ্জন স্মৃতি মন্দির, কদমতলা, হাওড়া

পরিচালনায়ঃ শিবাজী সঙ্ঘ, ইছাপুর, হাওড়া

বিশেষ প্রতিবেদন

পরিচালনায়ঃ মন্দির তলা, হাওড়া

পরিচালনায়ঃ পাগলা ফৌজ, কদম তলা, হাওড়া

পরিচালনায়ঃ ব্যাঁটরা মহিলা সমিতি, কদমতলা, হাওড়া

পরিচালনায়ঃ ব্যাঁটরা নবীন সঙ্ঘ, কদমতলা, হাওড়া

বিশেষ প্রতিবেদন

পরিচালনায়ঃ হাজার হাত কালীতলা সার্বজনীন, শিবপুর, হাওড়া

*এই প্রতিবেদনের সমস্ত ছবি শিশু শিল্পী রিত্বিকা চ্যাটার্জির নিজের হাতে তোলা।

যোগাযোগঃ contactpandulipi@gmail.com

শরতের ঈশা

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

কলকাতা শহর আমাকে ছেড়ে ছিল, না আমি কলকাতা শহরকে ছেড়ে ছিলাম; এত বছর পরে এসে তার হিসাব মেলানো কঠিন। তবে প্রায় চোদ্দ বছরের বনবাস থেকে ফিরে আসার পর অন্তরের স্বাভাবিক ভাবনাগুলোর যেমন আমূল পরিবর্তন ঘটে, আমার মনও অনেকটা তেমনি বদলে গেছে। সেই চেনা কলকাতা শহরটাকে আধুনিকতার নতুন মোড়কে কেমন সাজানো গোছানো হয়েছে – তা দেখতে ও জানতেই এই এত বছর পর আমার এই শহরে আসা। কিন্তু এখানে ফিরে এসে উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে নিরাশই হলাম। মনের চিত্রপটে আঁকা সেই নস্টালজিক ছবির সাথে কোনো রকম মিলই খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই পুজোর আমেজের সুবাস। কেমন যেন ঘুন ধরা সভ্যতার সাজানো পুতুলগুলো এলোমেলো ভুয়ো জৌলুসে বিরাজ করছে। না আছে প্রাণের মহিমা, না আছে আন্তরিক আবেদন। কোথাও কোথাও মায়ের মৃন্ময়ী রূপে চিন্ময়ী প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগেই বিলাসীতার আড়ম্বরের দামামা বাজিয়ে পূজা পরিক্রমা শুরু হয়ে গেছে। এখানে এসে বুঝলাম সত্যি সব পাল্টে গেছে —

সন্ধান

প্রকৃত মহামায়ার প্রকাশ কোথায়?

আমি শরৎ সরকার। কর্মসূত্রে প্রায় বহু বছর নিজের চেনা শহরের বাইরে। নিজের বলতে এইখানে কেউ আর নেই। আছে শুধু একটা সাবেকি বাড়ি। বহু বছর অযত্নে সে বাড়ির অবস্থাও একবারে শোচনীয়। পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে এই পাঁচ শরিকের বাড়ির একটা অংশ আমি পেয়েছি। পুজো শুরুর এক সপ্তাহ আগেই কলকাতায় পৌঁছালেও এখানাকার অনাবশ্যক নব্য ভাবধারা দেখে আমার মন প্রায় ভেঙেই গেছে।

দেখতে দেখতে পুজোর দুটো দিন কেটে গেল। আজ অষ্টমী। পাড়ার মণ্ডপ থেকে মাইকে অঞ্জলীর মন্ত্রের সুর বেশ ভালোভাবে ভেসে আসছে। জানলার সামনে বসে চা পান করতে করতে আমার চোখ গিয়ে পড়ল — এক দেওয়ালে ঘোষেদের বাড়ির দিকে। আমার ঘরের ঠিক সোজাসুজি ঘোষেদের বাড়ির বন্ধ জানালাটা দেখে মনটা কেমন যেন আনচান করে উঠল। মনের কোণে লুকানো পুরানো গল্পের খাতা থেকে ভেসে এলো একরাশ স্মৃতির পাহাড়। মনে পড়ল সেই আমার বিদেশ চলে যাওয়ার দিনও এই জানলাটা খোলা ছিল। আর জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ... তার সেই চাহনি আজও ভুলতে পারিনি। মনে মনে ভাবলাম, এত বছর পর যখন এসেছি এখানে, তাহলে যাই না একবার। দেখা করে আসতে ক্ষতি কি! তবু

মনের মধ্যে আমার একটা সংকোচ বোধ কাজ করছে। অবশেষে মন স্থির করে সোজা গিয়ে হাজির হলাম পাশের বাড়ির দরজার সামনে।

প্রথমে ওরা আমাকে দেখে চিনতে না পারলেও পরিচয় দিতেই সানন্দে ঘোষ বাড়ির সবাই আমাকে আপ্যায়ন করে নিল। বাড়ির সবার সাথে আলাপ হলেও যার জন্য আসা, তার সাথে আর দেখা হল না। বলা যায়, একরকম আশাহত হয়েই ফিরলাম। তবে আমি এসব কথা শুনব বলে প্রস্তুত ছিলাম না। ঘোষ বাড়ির লোকের জন্য নাকি সেই মানুষটি কিছুই করেনি।

এত বছর বাইরে থাকলেও আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ওদের কথায় বেশ অসংযম আছে। কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম সংসারের প্রতি তার অক্লান্ত অবদান। কিছুই ভালো লাগছিল না। বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত মনটা একটু হালকা করার জন্য আশপাশের প্যান্ডেলগুলোতে ঘুরতে লাগলাম। বারে বারে মনে হচ্ছিল এ ও কি সম্ভব!

আমার মনে যতটা ভাবনার মেঘ জমেছে, তার চেয়ে অধিক মেঘে আকাশ একেবারে ঘনায়মান কালো হয়ে গেল। দেখতে দেখতে হঠাৎ অঝোরে বৃষ্টি নেমে এল। আমি সামনের একটা প্যান্ডেলে ঢুকে ফ্যানের সামনে বসে পড়ি। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি, আর মণ্ডপে ঢাকের বাদ্যির সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। খানিক বাদে ঢাকের

শব্দের পরিবর্তে একটা শোরগোল শুনতে পাই। এক মহিলার সাথে মন্ডপের বাকি জনসাধারণের কিছু নিয়ে বাকবিতণ্ডা বেঁধেছে। আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মণ্ডপের পুরোহিতসহ কেউ-ই ওই মহিলাকে কিছুতেই লাইনে দাঁড়াতে দেবে না। সবাই মিলে তাকে প্রায় বাধ্য করছে পুজো দেওয়ার লাইন থেকে সরে যাওয়ার জন্য। শেষে তাকে প্রায় ঠেলে বাইরে ফেলে দিল। আমি এগিয়ে না এলে প্রতিবন্ধী মহিলাটি হয়তো পড়েই যেত। তাকে ধরতে গিয়ে আমি তো একবারে হতচকিত হয়ে গেলাম একি এ তো সেই চেনা মুখ। হ্যাঁ সেই চোখ, সেই হাসিমাখা মুখ। শুধু যেন অকালেই বয়সের ভার নেমে এসেছে এই সুন্দর মুখশ্রীতে। আমি অস্পষ্ট গলায় বললাম, "চিনতে পারছ আমি শরৎ..."

সে আমার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "শরৎ তুই! এতো বছর পর... আমি তো ভেবেছিলাম এ জন্মে আর দেখা হবে না তোর সাথে। কবে এলি? দেখনা সেই সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, পূজো দেবো বলে। কিন্তু আমার নোংরা পোশাক দেখে কেউ আমাকে লাইনে ঢুকতেই দিল না। আর ওদেরই বা দোষ কি? সবাই এতো সুন্দর করে সেজে এসেছে। এখন আমার জন্য ওদের জামা কাপড় নষ্ট হয় যাবে, তা কি হয়! এক কাজ করতে পারবি? আমার হয়ে তুই একটু পুজোটা দিয়ে

দিবি? এই আমার পুজোর থালা আর এই কাগজে আমার বাড়ির সবার নাম গোত্র লেখা আছে। ও হ্যাঁ, তোর নাম গোত্রটাও বলে দিস। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি তুই পুজো দিয়ে আয়।” আমি পূজো দিয়ে এসে জানতে চাইলাম, “তুমি এখন ঘোষ বাড়িতে থাক না ঈশা দিদি?”

ঈশাদি মুচকি হেসে বলল, “না। একটা সময়ের পর হয়তো প্রিয়জনেদেরও প্রয়োজন ফুরায়। তাই তাদের জন্য শুধু শুভ কামনাটাই তোলা থাক। আমার ঠিকানা এখন মাতৃসেবা সদনে।” তারপর ঈশাদি মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি অবাক হয়ে শুধু কথাগুলো শুনে গেলাম। আর যে সব প্রশ্নের ভিড়ে মনটা এতক্ষণ অশান্ত হয়েছিল। ঈশাদির একটা কথায় তার সমাধান হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম যারা এক সময়ে সংসার পরিবার পরিজনের জন্য প্রাণপাত করে, নিজের সব সুখ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে অন্যের খুশিকে আপন করে নেয়; তারাই দিনের শেষে হয়ে যায় অপাংতেয়।

এদিকে মেঘ কেটে এক টুকরো রোদের সোনালী আলো ঈশাদির মুখের ওপর এসে পড়েছে। আর আমি যেন হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য সন্ধিপুজোর এই সন্ধিক্ষণে খুঁজে পেলাম প্রকৃত মহামায়ার সন্ধান... ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান
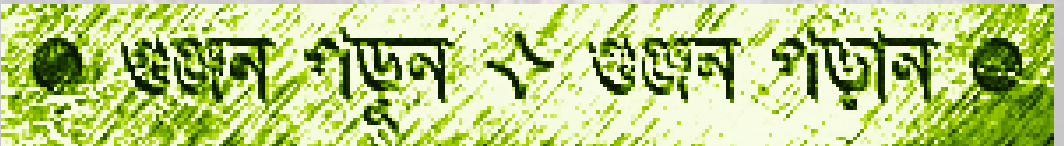
আলোকচিত্র

ছবির নামঃ বাগবাজারের পুজোর প্যাণ্ডেল...

চিত্রগ্রাহকঃ সোহম মন্ডল

হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাসুখম্।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারীং হরপ্রিয়ে ।।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তু তে ।।

মধ্যম বর্গীয়

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

লেখাপড়ায় তেমন সাফল্য না দেখাতে পারলেও, ছাত্র জীবনে কিছু শিখেছিলাম, আর তার জোরে সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে একটা সরকারি চাকরিও জোগাড় করে ফেলেছিলাম অনেক অল্প বয়সে। তারপর থেকেই জীবনের গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে দিন কাটাচ্ছি। সকালে চু চা করে চা খেতে খেতে সংবাদ পত্রে চোখ বোলানো, তারপর 'ট্রেন'-এর ভীড়ে অগণিত সংবাদ-বিশ্লেষণ শুনতে শুনতে ঘর্মাক্ত কলেবরে অফিসে পদার্পণ। এভাবেই কেটে গেছে জীবনের অনেকগুলো বছর, আমার গোঁফের রং কালো থেকে এখন সাদা হয়েছে।

তবে বিগত কয়েক বছর ধরে এই 'ট্রেন'-যাত্রায় আংশিকভাবে হলেও একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। কম বয়সীরা এখন 'মোবাইল স্ক্রীন'-এর মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে ভালবাসে, তাদের দেখাদেখি আমাদের বয়সী অনেকেও বেশ ঐ অভ্যাসটা রপ্ত করে ফেলেছে। তাই, 'ট্রেন' যাত্রাকালে এখন সংবাদ-বিশ্লেষকদের সংখ্যায় বেশ ভাটা পড়েছে।

অফিস, সেখানেও বেশিরভাগ সময়টা আজকাল কাটাতে হয় এর ওর তার নামে সমালোচনা শুনে, আর চা খেয়ে। কাজের চেয়ে অফিসে আড্ডাই মারতে হয় বেশি, তা না হলে একঘরে হয়ে পড়লেই মুশকিল। তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ, তাই সময়মত কাজ শেষ না করেও, 'সারভার' কিংবা 'ইন্টারনেট'-এর ওপর দোষ চাপিয়ে বেশ চলে যাচ্ছে।

চোখে না দেখা গেলেও, গোঁফের সাথে সাথে শরীরের ভিতরের রংটাওতো বদলেছে, কলকব্জাগুলো এখন শিথিল হচ্ছে। তাই তাদের চাঙ্গা রাখতে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা না নিলেই নয়। ক'দিন আগেই 'হাউস ফিজিসিয়ন' রোজ একটু 'ব্রিস্ক ওয়াকিং' করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বাড়ি ফেরার পথে 'স্টেশন'-এর রাস্তাটা বেশ নিরিবিলি। তাই ঠিক করলাম, রোজ 'ট্রেন' থেকে নেমে, ওখানেই একটু 'ব্রিস্ক ওয়াকিং' শুরু করি। রাস্তাটা নেহাত কম তো নয়, প্রায় দেড় কিলোমিটার তো হবেই। এই বয়সে, ঐ যথেষ্ট। অতএব টোটো চড়ার সুখ ছেড়ে শুরু করলাম পায়ে চলা।

টোটো চড়ে যাতায়াত করার সময় দু'একবার দেখেছিলাম যে 'স্টেশন রোড'-এর পাশে একটা চাতালের ওপর, দলবল নিয়ে বসে থাকে আমারই এক কালের সহপাঠী বিপ্লব। চেহারাটা এখনও তেমনই ষণ্ড মার্কা, দেখে মনে হয় বিপ্লবের বয়স একটুও বাড়েনি। স্কুলের গণ্ডি না পেরলেও,

ও এখন আমাদের এলাকার একজন বড় নেতা, খুব নামডাক ওর। আর হবে নাই বা কেন? শুনেছি ওর 'রেকমেণ্ডেশন'-এ অনেকের চাকরি হয়েছে, অনেক মহিলা বিধবা-ভাতা পাচ্ছেন – যাঁদের কেউ কেউ সধবা অথবা অবিবাহিতা, আরও কত কি...

যাক সে কথা, আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছাপোষা মানুষ। আমার দ্বারাতো আর কোনরকম পরোপকার কখনও হোলনা, আর কলেজের গণ্ডি পার হয়েই বুঝেছিলাম যে কাগজের 'সার্টিফিকেট'-গুলো শুধু দেখতে এবং দেখাতেই ভাল, ও দিয়ে খুব একটা বড় কিছু করা সম্ভব নয়। সে যা হোক, ইশ্বরের দয়ায় মাঝারি থেকেও বেশ কাটিয়ে তো দিলাম, আর কি চাই?

হপ্তাখানেক বেশ 'ব্রিস্ক ওয়াকিং' হোল, শরীরের সাথে সাথে মনটাও বেশ চাঙ্গা হচ্ছিল। কিন্তু ঐ যে কথায় বলে না – 'ম্যান প্রপোসেস, গড ডিসপোসেস'... একদিন হঠাৎ বাড়ি ফেরার সময় পিছন থেকে কে যেন খপাৎ করে আমার ঘাড়টা চেপে ধরল। শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এই 'ব্রিস্ক ওয়াকিং' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু এই ক'দিনে এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারিনি যে সেই প্রবল মুষ্ঠি-পাশ থেকে নিজের গর্দানটিকে রক্ষা করি। অগত্যা মিউমিউ করে বললাম, "কে আপনি?" সহসা কে যেন এক বিকট অট্টহাসি দিয়ে আমার ঘাড়টা

ছেড়ে দিয়ে বলল, "আ বে চিনতে পারলি না? আমি বিপ্লব রে... এত ভরকে গেলি কেন?"

দু'হাত দিয়ে ঘাড়টা ডলতে ডলতে, আমি আমতা আমতা করে বললাম, "না মানে ইয়ে... তু তু তু তুই?"

বিপ্লব বলল, "আরে ছাড়, আমার হাতে বেশি সময় নেই বুঝলি। তোকে একটা খুব জরুরি কথা জানাতে এলাম।"

আমি হতভম্বের মত ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কথা রে?"

– জানিস, আমরা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?

– হতচকিত হয়ে আমি একবার আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললাম, "কেন? রাস্তার ওপরে..."

– "রাস্তার ওপরে...," ঝাঁঝিয়ে উঠল বিপ্লব। তারপর সে খুব গম্ভীরভাবে বলল, "হুঁ, তোর বয়সটাই শুধু বেড়েছে, বুদ্ধি এখনও পাকেনি।"

– আমি কাটিয়ে দেবার জন্য বললাম, "তা হয়ত হবে।"

– জানিস কি, আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার সৈন্যরা চলে যাওয়ায় দেশটায় কি চলছে? বায়ুমণ্ডলে পি.এম. ২.৫ এই হারে বৃদ্ধি পেলে আগামী দশ বছরে পৃথিবীর কত শতাংশ লোক ফুসফুসের অসুখে মারা যাবে? এ সবের প্রতিবাদ হওয়া জরুরি কিনা?"

– হ্যাঁ, তাতো হওয়াই উচিত।

– তবে চল, দীঘায়।

– দীঘায়, এই ভরা সন্ধ্যায়?

– না, রবিবারে বেরোব। এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম। কালই অফিসে ছুটির দরখাস্তটা জমা করে দিবি, বুঝলি? খুব 'সিরিয়াস ডিসকাশন' আর 'ডিসিশন মেকিং'- এর ব্যাপার। তাই এ ক'দিন একটু 'জিওপলিটিক্স' নিয়ে পড়াশোনা করে নিস। মনে থাকবেতো?

– হঠাৎ কেমন যেন মনে পড়ে গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের 'ব্যাচ'-এ আমিই 'জিওপলিটিক্স'-এর 'পেপার'-এ সব চেয়ে বেশি 'মার্কস' পেয়ে ছিলাম। কিন্তু জীবনে তা আর কোথায় কাজে লাগল! সবই তো ঐ 'থোর বড়ি খাড়া – আর খাড়া বড়ি থোর'।

– আমাকে অন্যমনস্ক দেখে, আবার পিঠে একটা হাড়-ভাঙ্গা চাপড় মেরে, বিপ্লব বলল, "কি হোল রে?"

– সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, আমি বললাম, "হ্যাঁ, ইয়ে, মানে দেখি, কি করতে পারি..."

এরপর দু'দিন কেটে গেছে। ফেরার পথে আর বিপ্লবের সঙ্গে দেখা হয়নি। ভাবলাম বুঝি ফাঁড়া কাটল। কিন্তু তৃতীয় দিনে আবার সশরীরে মূর্তিমান হাজির। এবার সামনে থেকেই এসে, আমার পথ আঁটকে দাঁড়াল বিপ্লব।

বেশ একটা জরিপের ভঙ্গীতে একবার আমাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে সে বলল, "হ্যাঁ, একটা কথা তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এত বড় বড় গুণীজন

আসবেন, তাঁদের বক্তব্য শুনবি, তারপর 'অ্যাক্সন' শুরু করতে হবে। তা সেসবের একটা খরচ আছে তো... তাই আমরা সবার থেকে, বেশি না, মাত্র দশ হাজার টাকা করে অনুদান নিচ্ছি। তোর সাথে যদিও রোজই দেখা হচ্ছে, তবে আর তো সময় বেশি নেই, কালই টাকাটা দিয়ে দিস কিন্তু।"

রীতিমত চমকে উঠলাম আমি। তার পরের দিন থেকেই ট্রেন ছেড়ে বাসে চড়ে অফিসে যাতায়াত শুরু করলাম। ঐ বাস রাস্তাটার দিকে বিপ্লবদের খুব একটা আনাগোনা ছিল না। তাই আর দেখা হয়নি।

তবে, এই ক'দিন আগেই পাড়ায় শুনলাম – অধিক মদ্যপান করে 'হাইওয়ে' দিয়ে 'ড্রাইভ' করে যাবার সময় দীঘার রাস্তাতে বিপ্লবদের গাড়িটা বিশ্রীভাবে 'অ্যাক্সিডেন্ট' করেছিল। ওদের কেউই বাঁচতে পারেনি।

আবার 'ট্রেন'-এ যাওয়া শুরু করেছি, সাথে সাথে 'ব্রিস্ক ওয়াকিং' ও চলছে। এখন আরও কয়েকজন সমভাবাপন্ন সঙ্গী পেয়েছি। তবে প্রতিদিনই আমরা নজর রাখি – চাতালটায় আবার কোন নতুন বিপ্লবের উদ্ভব হচ্ছে না তো... ■

পড়ুন, ডাউনলোড ও শেয়ার করুন

আমাদের প্রকাশিত (নিঃশুল্ক) ই-বুক

উপাখ্যান আখ্যান মহাখ্যান

URL: http://online.fliphtml5.com/osgiu/ozzm/

অক্ষরাঞ্জলি

URL: https://online.fliphtml5.com/osgiu/csjb/

বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী

URL: https://online.fliphtml5.com/osgiu/optm/

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান